সিডনী বৈশাখী মেলার রজত জয়ন্তীঃ আন্তরিক শুভকামনা

খন্দকার জাহিদ হাসান

বহমান নদী। বহমান সময়। বিকাশমান আমাদের লোকাচার। আসে খরা। আসে বান। আসে কালবোশেখির ঝঞ্ঝা। চোত-বোশেখের সীমারেখা টেনে দিতে দিতে আসে নতুন বছর। হাজার হাজার বছরব্যাপী কৃষি-নির্ভর বাঙ্গালী জাতির ঘরে ঘরে নতুন দিনের বারতা বয়ে নিয়ে আসে নববর্ষ। নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে কৃষকের দুচোখ।

আবহমান কাল হতে হিন্দু সৌর বছরের প্রথম দিন আসাম, বঙ্গ, কেরালা, মণিপুর, নেপাল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পালিত হয়ে এসেছে। এক সময় নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আর্তব উৎসব তথা কৃষিভিত্তিক ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হত। কারণ তখন কৃষিকাজের জন্য কৃষকদের ঋতুর উপরই নির্ভর করতে হত। কালের বিবর্তনে সেই উৎসবটি পরবর্তী পর্যায়ে নতুন বছরের সূচনালগ্নে পালিত একটি সার্বজনীন পরবে পরিণত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে নববর্ষ পালনের অন্যতম মহোৎসব হিসাবে বৈশাখী মেলা আমাদের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের বাইরে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রবাসী বাঙ্গালীর বৃহত্তম মিলন মেলা হলঃ বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত সিডনীর বৈশাখী মেলা। (এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাঙ্গালী সম্প্রদায় আয়োজিত সুবৃহৎ মেলাটি একটি পথ-মেলা বিধায় তা বিবেচনার বাইরে পড়ে বলে সুধী সমাজ মনে করে।) এমনকি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও এখন ব্যাপক হারে এই বৈশাখী মেলাতে আসতে শুরু করেছে। ২০১৭ সালে সিডনী বৈশাখী মেলা পঁচিশতম বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে ক্ষুদ্রাকারে তৎকালীন বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত সিডনীর প্রথম বৈশাখী মেলা ক্রমান্বয়ে আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত বিশাল এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে এই মেলার জনপ্রিয়তা ও ব্যাপ্তি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, স্থান সংকুলানের কথা বিবেচনা করে এর ভ্যেনু ক্রমে বৃহত্তর অঙ্গনে স্থানান্তরিত হতে হতে বারউড গার্লস স্কুলের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে সিডনী অলিম্পিক পার্কের অ্যাথলেটিক সেন্টার, টেনিস সেন্টার এবং সব শেষে এ,এন,জেড স্টেডিয়ামের সুবিশাল পরিসরে গিয়ে পৌঁছেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলেবর ও সৌন্দর্য, স্ফীতি ও শোভা এবং আয়তন ও উৎকর্ষতা হাত ধরাধরি করে বৃদ্ধি পেতে থাকায় সমগ্র বিষয়টি একটি ক্ল্যাসিক্যাল রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই যে পরম এক প্রাপ্তি, চরম এক সফলতা- তার নেপথ্যে রয়েছে সুসংগঠিত ও নিবেদিতপ্রাণ একদল নিঃস্বার্থ মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম।

এ বছর সিডনী বৈশাখী মেলার গৌরবময় রজত জয়ন্তী উদযাপিত হতে চলেছে। সেই শুভ রজত জয়ন্তীর প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়া একটি অনাড়ম্বর অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কম্যুনিটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে। ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ রোববার মধ্যাহ্নে রকডেলের রেডরোজ ফাংশন সেন্টারের মনোরম পরিবেশে ছিল সেই আয়োজন। নিঃসন্দেহে ভোজনের ব্যাপারটি ছিল উপলক্ষ মাত্র। মূল উদ্দেশ্যঃ আসন্ন শুভ রজত জয়ন্তী পালনের বিষয়টিকে সামনে রেখে শুভ এই লগ্নকে 'ক্রান্তিলগ্ন' বিবেচনা করে বিরাট এই সফলতার সার্বিক মূল্যায়ন, বর্তমান স্ট্যাটাস নির্ধারণ, কম্যুনিটিভুক্ত লোকজনের মতামত গ্রহণ, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোকপাত, ইত্যাদি। সেই অনুষ্ঠানে অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দের মাঝে দলমত নির্বিশেষে সব পর্যায়ের মানুষই ছিলেন। বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেনের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সাধারণ সম্পাদক তুষার রায়ের অনবদ্য বক্তব্য প্রদান অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

অভ্যাগত অতিথিদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বক্তা আয়োজকদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সাধুবাদ জানানো ছাড়াও নানা ধরণের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন, যা ছিল খুবই উপভোগ্য। কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে, বৈশাখী মেলা দিন দিন তার আদি দেশীয় চেহারা হারিয়ে ফেলছে এবং মেলাতে মাল্টিকালচারাল বৈশিষ্ট্য ক্রমেই প্রকটতর হয়ে উঠছে। তবে আয়োজকদের পক্ষ হতে তার জুতসই জবাব দেয়া হয়েছে। বিশেষতঃ বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সম্পৃক্ত এবং সংগঠনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শেখ শামিমুল হক চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্থাপিত সকল ইস্যুরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শেখ শামিমুল হক কেবল দক্ষ সংগঠক ও করিতকর্মা সমাজসেবীই নন, স্থিরচিত্তের একজন সুবক্তাও বটেন। মৃদুভাষী এই মানুষটির বক্তব্য সর্বদাই শৈল্পিক মাত্রা লাভ করে। তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলা যায় যে, এই বিশ্বের সবকিছুই বিবর্তিত হয়ে চলেছে। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিবর্তনের বিষয়টি আরও বেশী করে প্রযোজ্য। এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারটি আমাদের সবাইকেই মেনে নিতে হবে। পুতুল নাচের দিন বিদায় নিয়েছে। নৌকা বাইচ বা লাঠিখেলার আয়োজন করাও প্রবাসের মাটিতে সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানদেরও প্রতিদিন জুটছে ভিন্ন সংস্কৃতি হতে আসা নতুন নতুন বন্ধু, যাদের সাথে তাদের নিত্যদিনের ওঠা-বসা আর মেলামেশা। তাই অনেক বিষয়েই আমাদেরকে আপস আর সমঝোতা করতে হবে বৈকি।

সিডনী বৈশাখী মেলার রজত জয়ন্তী সফল হোক, বৈশাখী মেলা অমর হোক, আর তার আয়োজনকর্তারা দীর্ঘজীবী হোন- আন্তরিক এই শুভকামনা রইল।

এবারে সংক্ষেপে বৈশাখী মেলার ইতিকথা তুলে ধরা যাক। মুঘল শাসনামলে চন্দ্রীয় হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায়ের চল ছিল। কিন্তু চান্দ্রিক সন ঋতু মানে না বলে কৃষি ফলনের সাথে তার গরমিল বছর বছর বেড়েই চলল। তাই ঝামেলা দেখা দিল খাজনা আদায়ের কাজে। শেষে সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহামতি সম্রাট আকবরের নির্দেশে তৎকালীন বাংলার খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেউল্লাহ সিরাজি সৌর সন ও হিজরি সনের সমন্বয়ে নতুন বাংলা সন প্রবর্তন করেন। এই কালজয়ী সংস্কারের হাত ধরেই এরপর থেকে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে প্রজাদের সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করার আইন জারী হল।

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ মতান্তরে ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে "বঙ্গাব্দ" বা "বাংলা বর্ষ" নামে পরিচিত হয়। আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু হয়। এর পর দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষে হালখাতাসহ বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হত। এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, যা বিকশিত হতে হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। সর্বপ্রথম ১৯১৭ সালে আধুনিক রীতিতে নববর্ষ উদযাপনের তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর পহেলা বৈশাখে হোম কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালেও অনুরূপ কর্মকান্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ১৯৬৭ সনের পূর্বে ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালনের রীতি তেমন একটা জনপ্রিয় হয়নি।

অতীতে ঈশা খাঁর সোনারগাঁওয়ে ব্যতিক্রমী এক মেলা বসত যার নাম "বউমেলা", এটি স্থানীয়ভাবে "বটতলার মেলা" নামেও পরিচিত। বিশেষ করে কুমারী, নববধূ, এমনকি জননীরা পর্যন্ত তাঁদের মনস্কামনা পূরণের আশায় এই মেলায় এসে পূজা-অর্চনা করতেন। সন্দেশ-মিষ্টি-ধান দূর্বার সঙ্গে মৌসুমি ফলমূল নিবেদন করে ভক্তরা। পাঁঠাবলির রেওয়াজও পুরনো। বদলে যাচ্ছে পুরনো অর্চনার পালা। এখন অবশ্য কপোত-কপোতি উড়িয়ে শান্তির বার্তা পেতে চায় ভক্তরা দেবীর কাছ থেকে।

এ ছাড়া সোনারগাঁ থানার পেরাব গ্রামের পাশে আরেকটি মেলার আয়োজন করা হয়। এটির নাম ঘোড়ামেলা। লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে যে, 'যামিনী সাধক' নামের এক ব্যক্তি ঘোড়ায় করে এসে নববর্ষের এই দিনে সবাইকে প্রসাদ দিতেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পর ওই স্থানেই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ বানানো হয়। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে স্মৃতিস্তম্ভে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একটি করে মাটির ঘোড়া রাখে এবং সেখানে মেলার আয়োজন করে। এ কারণে লোকমুখে প্রচলিত মেলাটির নাম "ঘোড়ামেলা"। এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে নৌকায় খিচুড়ি রান্না করার পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই কলাপাতায় আনন্দের সঙ্গে তা ভোজন করা। এক দিনের এ মেলাটি জমে ওঠে দুপুরের পর থেকে। যদিও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কারণে এ মেলার আয়োজন করা হয়, তবে সব ধর্মের লোকজনেরই প্রাধান্য থাকে এ মেলায়। এ মেলায় শিশু-কিশোরদের ভিড় বেশি থাকে। মেলায় নাগরদোলা, পুতুল নাচ ও সার্কাসের আয়োজন করা হয়। সূর্যাস্তের পর সে মেলায় নতুন মাত্রায় যুক্ত হয় কীর্তন। এ কীর্তন চলতে থাকে মাঝরাত পর্যন্ত।

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেছে। একে একে মুঘলের শাসন, বর্গীর উপদ্রব, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ আর পাকিস্তানী দুঃশাসনের অবসান ঘটেছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে আপামর বাঙ্গালীর প্রাণের উৎসব নববর্ষ আরও বিকশিত হয়েছে, আরও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে, দিন দিন আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ। কয়েকটি গ্রামের মিলিত এলাকায়, কোন খোলা মাঠে আয়োজন করা হয় বৈশাখী বা বোশেখী মেলার। মেলাতে থাকে নানা রকম কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর বিপণন, থাকে নানারকম পিঠা পুলির আয়োজন। অনেক স্থানে ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়ার চল রয়েছে। এই দিনের একটি পুরনো সংস্কৃতি হলো গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। এর মধ্যে নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা ও কুস্তি একসময় প্রচলিত ছিল।

ঢাকার বৈশাখী উৎসবের একটি আবশ্যিক অঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ ভোরে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। এই শোভাযাত্রায় গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। শোভাযাত্রায় সকল শ্রেণী-পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার জন্য বানানো হয় বিভিন্ন রঙের মুখোশ ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি। ১৯৮৯ সাল থেকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা পহেলা বৈশাখ উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পহেলা বৈশাখের মূল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন বছরের সূর্যকে আহ্বান। পহেলা বৈশাখ সূর্যোদয়ের পর পর ছায়ানটের শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরকে বরন করে নেন। স্থানটির পরিচিতি বটমূল হলেও প্রকৃতপক্ষে যে গাছের ছায়ায় মঞ্চ তৈরি হয় সেটি বট গাছ নয়, অশ্বত্থ গাছ। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানটের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা।

যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকুক আমাদের লোকাচার ও কৃষ্টি- দেশে ও বিদেশে।
[ইতিকথার তথ্যসূত্রঃ উইকি]
সিডনী, ২০/০২/২০১৭